"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৬ তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রণ : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / অন্তর্জালে প্রকাশ : এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৬৭ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৬ই কার্ত্তিক, ১৪৩২ / 24.10.2025

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

-: সূচীপত্র :-

(৬৭ তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

ভারতের প্রাণ	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
আত্মকথা	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
একটি সাক্ষাৎ	শ্রী অশোক রায়
সুখ-দুঃখের দোলাচলে-চৈতন্যের সন্ধান	শ্রী সৌমিত্র মজুমদার
পিসার মিরাকল	শ্রী অরূপকুমার ভট্টাচার্য
সর্ব সমর্পণ	শ্রী শান্তশীল দাশ
পালিয়ে বাঁচা	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, thereafter converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and to be published in the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

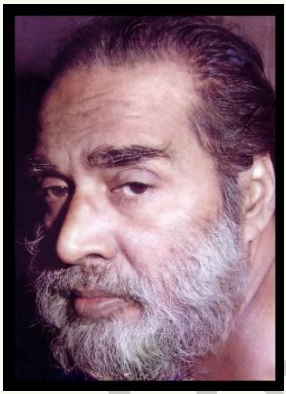

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

ভারতের প্রাণ

"যখন যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, হয় অধর্মের অভ্যুত্থান, তখন তখনই তিনি নিজেকে সৃজন করেন, অব্যক্ত তিনি ব্যক্তিরূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করেন।

আজ আমরা অধিকাংশ দেশবাসী বিষ খেতে ভালবাসছি, অমৃত ত্যাগ করে মরণের পথে, ধ্বংসের পথে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছি। কোথায় চলেছি তা' আমরা জানিনা, বুঝিনা। পরানুকরণপ্রিয়তাই এখন আমাদের নিলয়ের পথে, নিরয়ের পথে নিয়ে চলেছে।

আজ আমরা সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছি তাঁর জন্য।

তিনি আসবেনই। আসতে তাঁকে হবেই। কিন্তু কিভাবে, কোন মূর্তিতে – তা' আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু তিনি আসবেনই। তিনি যে জগতের ত্রাণকর্তা। ভারতের প্রাণ।"

শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ ও শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

আত্মকথা **শুক্লা ঘোষ**

স্মৃতিচারণ থেকে আত্মকথায় এসে আমি বেঁচে গেলাম। আমি নিজেই তো তাঁর স্মৃতি বহন করছি, তাই আমার কথাই তো তাঁর জীবনের কথা। যে জীবন আমি তিরিশ বছর ধরে একভাবে ধরে রেখেছিলাম আমি জানি না সেই জীবন আমাকে আর কতদিন টেনে নিয়ে যেতে হবে।

অনেক সংসারে দেখেছি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন গত হলে অন্যজনও দু' চার বছরের মধ্যে চলে যান। সকলে বলাবলি করে দুজনে ভীষণ ভাব ছিল, তাই কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারেন নি। আমার সাথে শ্রীপ্রীতিকুমারের মধ্যে সেরকম আকর্ষণ কাজ করত কিনা জানি না। প্রথম জীবনে একটু আধটু ছটফটানি থাকলে থাকতে পারতো, কিন্তু ধীরে ধীরে কবেই যেন নদী সাগরে গিয়ে মিশেছিল। জোয়ার ভাঁটার প্রকাশ ছিল না। উনি বড়, আমি ছোট। উনিও জানতেন আমি সব কথা শুনে চলব। একদিন আমাকে বসিয়ে নানা কথার মধ্যে বলেছিলেন, "তুমি তো অবাধ্য নও।" মুখে যাই বলি না কেন কথা শুনতাম, আসলে সর্বদা বড় ব্যস্ত থাকতেন। দিনরাত ঐ টাকাওয়ালা, গাড়িওয়ালা ব্যক্তিরা সময়ে অসময়ে তাঁর সঙ্গ পেতে চাইতো। ছেলের পড়াশোনা, সংসার, নিজের পড়াশোনা সামলে অত আত্মীয়-অনাত্মীয়কে আদর আপ্যায়ন করা সব একাধারে আমাকে করতে হত। মেজাজ ঠিক

থাকতো না, ফলে যারা আসতেন তারা আমাকে রীতিমত এড়িয়ে যেতেন। প্রতিদিন ঐ ধরণের ভিড় দেখে আমিও বিগড়ে যেতাম। ফলে রাত দুপুরে বা ভর দুপুরে ওঁর খাবার সময়ে বা বিশ্রামের সময় কেউ এলে আমি রান্নাঘরের আড়াল থেকে সন্দেশ শুদ্ধ প্লেট throw করতাম। দু'মিনিটের মধ্যে দেখতাম বাড়ী খালি। অতিথি পলাতক।

অনেকদিন পর কিশোর বলেছিল, "আমার খুব অবাক লাগতো এমন একজন ব্যক্তিত্বের পাশে এটা একটা কি এসে জুটেছে ? কোথা থেকে এলো?" সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হল এখন মামীমার যে কোন সমস্যায় কিশোর সবচেয়ে আগে দৌড়ে আসে। আমার যে কোন নির্দেশ সে পালন করবার চেষ্টা করে। অন্ততঃ আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করলে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। কথা দিয়ে কথা রাখে। তাই তাকেও আমি স্নেহ ভালবাসা দিয়ে টেনে তোলবার চেষ্টা করি।

ইদানীং আমি ভীষণ heart-এর trouble-এ ভুগছি। নানারকম tension-এ তো ভুগিই, হঠাৎ আমাকে নিয়ে কেউ politics করলে আমার বুক ধড়ফড় করে ওঠে। তখন মনে হয় জীবনটা এত দীর্ঘ কেনো ? একটা সময় ছিলো, ঈশ্বরের কাছে কোনও দিনও কিছু চাইতে হত না – না অর্থ, না প্রতিপত্তি, না নিন্দা, না প্রশংসা। আমার অন্য কিছু চাইতে হত না। গত ছ' বছর চারমাস আমি মন্দিরে মন্দিরে, তীর্থে তীর্থে একটি প্রার্থনাই করে এসেছি – আমার দশদিন থেকে লালন করা সেই শিশুটি আমাদের বাড়ীতে ফিরে আসুক। সব শান্তি হোক। কিন্তু আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ হয়নি, তার বদলে আমাদের কাছে এসেছে আর একটি শিশু। এও আদর কেড়ে নিতে জানে, এও আমাকে খুব চিনেছে। কিন্তু আমি আঁকড়ে ধরতে পারি না। মনে হয় তার সেই পাওনাটা তো সে পাচ্ছে না। অনেক চেষ্টা করেছি, অনেক অর্থব্যয় করেছি, নীরেনদা, কিশোর, অনেকে আমাকে সহায়তা করেছেন,

কিন্তু case- টা তো আমার নয়। এখন দৈব যদি একেবারে ওলটপালট করে দেয় তাহলে কিছু হতে পারে। হয়তো সেটা আমি দেখে যাবো না আর। তবে হ্যাঁ, জ্ঞান আমাকে অনেকে দিয়েছে, নানা Reference টেনে আমাকে ভরসা দেবার চেষ্টা করেছে, আমার ভিতরে ধীরে ধীরে বিরক্তির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাও শাসিত মনের জন্য চুপ করেই থেকেছি। আমাকে শ্রীপ্রীতিকুমার অকৃতজ্ঞ হতে শেখান নি। কিন্তু কেউ উপকার করে যদি তৃতীয় ব্যক্তির কাছে ব্যাখ্যা করতে যান, আমি তো দুঃখ পাবই। আমি তো জানি শ্রীপ্রীতিকুমার তাদের জন্য কি কি করেছিলেন। আর এই ভাবধারার থেকেই দূরত্ব সৃষ্টি হয়। আমরা সবাই তো সাধারণ মানুষ, মেপে চলি। আমাদের অভিমান, রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ-তো থাকবেই। আর আমার ছোটবেলা থেকেই ভীষণ আবেগ ও জেদ কাজ করে। মুখ না দেখবার হলে আমি আর সেদিকে ফিরে তাকাই না।

আগামী ১০ই মার্চ শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিন। এই সময়ে আমরা অনেকে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করি। আমার কাছে তাঁর ঘরটিতে একটি প্রাণময় সত্তার অবস্থিতি অনুভূত হয়। চা, জলখাবার, দিনে রাতে খাবার দেওয়া, বিছানা করা, সবই যেন কেমন প্রতিদিনের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কেউ আছেন কি নেই এ বিচার করবার মানসিকতা একেবারেই নেই। আমরা একজনকে সেবা করছি, তিনি সেই সেবা গ্রহণ করছেন এটাই আমাদের বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কোন আশা পূর্ণ হলে মনে হয় তিনি আশীর্বাদ করেছেন। পূর্ণ না হলে মনে হয় এটা আমার প্রাপ্য ছিল না।

আমি অনেক মা-কে দেখেছি নিজের ছেলের সাফল্যের গল্প অন্যদের বড় গলায় শোনান। আবার সেই ছেলে যখন অনাচার করে, তাকে চাপা দেবার চেষ্টা করেন। যখন আর ব্যথা গোপন করা যায় না, সব প্রকাশ করে ফেলেন। আসলে

আমরা মায়েরা স্নেহের বশে ছেলেকে বড় হয়েছে বলে আলাদা ভাবে দেখবার চেষ্টা করি না। ছেলে কিন্তু বয়স অনুযায়ী ওজন বুঝে চলে। ফলে আমাদের মতো মায়েরা একটু কথার হেরফেরে কষ্ট পেয়ে বসি।

শ্রীপ্রীতিকুমার থাকতে আমি অনেক জিনিস জানতাম না। সব কথা সব সময়ে এসে গল্প করতেন না। তবে কাউকে বলতেন যখন, হয়তো শুনে ফেলতাম। সহ্য করা তাঁর স্বভাব ছিল। অনেক কষ্ট সহ্য করতেন।

একটি জিনিস ভীষণ অপছন্দ করতেন – "মদ"। যাদের মদ খাবার অভ্যাস্টা জল খাবার মতো, আমাদের কখনও তাদের বাড়ীতে যেতে দিতেন না। একজনের অতিরিক্ত নেশার জন্য শ্রীপ্রীতিকুমার তাঁকে শ্যামবাজারের বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এখন যদি থাকতেন আরও কতজনের মুখদর্শন করতেন না তার ঠিক নেই। আমি শুধু অবাক হয়ে যাই যারা তাঁকে মেনে চলে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে, তারা কি করে আবার ঐ তুচ্ছ নেশা নিয়ে বসে? মাঝে এ'সব নিয়ে ভাবতাম – এখন আর ভাবি না। যে যার কর্মফল ও প্রারব্ধ ভোগ করে, আমিও করি। কলেজে আমার Pay fixation আজও হয়নি। বহু টাকা Arrear বাকী। আমার জন্য কেউ claim করে দেয় নি। আমিও ঠিক বুঝতে পারি না কাকে কি ভাবে Request করলে কাজটা হবে। তাছাড়া আমি তো ঠিক কর্মস্থলে হৈহৈ করতে পারিনা। গলে যেতেও পারিনা। তাই আমার পাওনাগণ্ডাগুলি অপ্রাপ্যই থেকে যায়। আসলে আজকাল নিজের গায়ে রঙ না থাকলে কোনও কাজ হয় না। এগুলো ঈশ্বরের নির্দেশ বলেই মেনে নিই। ওর থেকে নিজেকে স্তোক দেবার আর কিছু নেই।

আজকাল আমার লেখার অভ্যাস্টা একেবারেই চলে যাচ্ছে। বাচেন্দ্রীর জন্য আমার সময়মতো লেখাই হয়ে ওঠে না। ঐ মুখটার প্রতি আমি কি আসক্ত হচ্ছি?

কি জানি ! মনে হয় আমাদের সৌভাগ্য যে ও আমাদের ঘরে এসেছে। ও যখন শ্রীপ্রীতিকুমারের Photo-র দিকে তাকিয়ে হাসে, হাত নাড়ে, আমার খুব অবাক লাগে। হাতগুলি ঘোরানো একেবারেই সেইরকম। পা দুটি সেই একই গড়ন। বললে কেউ কেউ ঠাট্টা করে। জিজ্ঞেস করে আমি শ্রীপ্রীতিকুমারকে ছোটবেলায় দেখেছি কিনা। একথাগুলি বলবার দরকার হয় না। কারণ একটি লোককে দীর্ঘদিন ধরে দেখতে দেখতে তার সমস্ত Movement-গুলিই মুখস্থ হয়ে যায়। আর তাঁর মতো অত আপন আমার জীবনে কেই বা ছিল?

মাঝখানে আমার পুত্তরের বিবাহের একবছর পূর্ণ হল। যারা তাদের শুভেচ্ছা জানাবেন ভেবেছিলেন তারা খুবই নিরাশ হয়েছেন, কারণ এ ব্যাপারে কোনও অনুষ্ঠানই হয় নি। আসলে আমাদের আর নতুন করে কিছু করবার কথা মনে হয় না। অনুষ্ঠান করবো সেদিন, যেদিন সেই দুটি শিশু এ' বাড়ীতে ফিরে আসবে। তবে আজকাল যা অবস্থা ! কোথাও সময়মতো কোনও কাজ হয় না। Lawyer-দের Advance Fee দেওয়া হয়। হাজিরা দেওয়া হয়। কিন্তু সময়মতো কোনও case-এর hearing হয় না। টাকা পাওয়ার আগে তারা এমন একটা ভাব করেন যেন এখনি High Court থেকে একটি Order বেরিয়ে যাবে। আমি অন্ততঃ একটি লিখিত নির্দেশ জারী করব যে আমার বংশে কেউ আইনজ্ঞ হবে না। ঐ পেশাটিতে আমার বিরক্তি এসে গেছে। মানুষকে ভোগাবার এমন রাস্তা আর নেই।

এবার পার্থসারথির গ্রাহকদের একটি অনুরোধ করি। ডাকে যদি বই না পান আমার দোষ নেই। নতুন করে বই পাঠানো সম্ভব নয়। আমরা তিনজনে মিলে ঠিকানা লিখি, Stamp লাগাই, গ্রাহক খাতা মেলাই, কোনও ভুল করার সুযোগ থাকে না। তারপর ডাকের গোলমাল হলে আমি নিরুপায়। অনেকে এডভান্স টাকা পাঠিয়ে শ্রীপ্রীতিকুমারের লেখা বই ডাকে পেতে চান। আমাদের V.P. করবার কোনও ব্যবস্থা

নেই। রেজিস্ট্রি করলে অনেক খরচ। পোস্ট অফিসে গিয়ে সময়মতো রেজিস্ট্রি করাও হয় না। তাঁরা যদি দয়া করে কোনও লোককে এখানে পাঠান বা কলকাতার মধ্যে কোনও ঠিকানা আমাদের দেন, তাহলে আমি সেখানে বই পৌঁছে দেবো। আশা করি আমাদের এই অসুবিধাটা তারা বিবেচনা করবেন।

দোল পূর্ণিমা চলে যাচ্ছে। ছোটবেলা থেকে রঙ খেলতে আমি খুব ভালোবাসি। শ্রীপ্রীতিকুমার প্রয়াত হবার পর আমি আর রঙে হাত দিই নি। ইচ্ছেই হয় না। একটা মানুষ সমস্ত জীবনের রঙ সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। দিন চলে যায়, কিন্তু যেখানটায় শূন্যতা, সেখানটা আর কোনও ভাবেই পূর্ণ হয় না। আমার জীবনটা কেমন অন্যরকম ছিল। গান, বাজনা, N.C.C, Mountaineering, Trekking নিয়ে সব সময় হৈহৈ করেছি। সেই আমার সময় কাটে না। এখন আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবের কাছে যেতে ইচ্ছে করে না। অথচ আগে আমি সময়ই পেতাম না। এখনও আমি সারাদিনই কাজ করি, তবু আমার যেন অনেক সময় ! আমি যেন কার পদধ্বনি শুনবো বলে বসে আছি। জীবনটা এখন অনেক বড় মনে হয়।

সবশেষে দুঃখের সঙ্গে জানাই আমাদের পরমাত্মীয় ডঃ হরিপদ চক্রবর্তীর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে গত মাসে। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি যে কত একা হয়ে গেলেন তা বলাই বাহুল্য। তাঁর এ ক্ষতি পূরণ হবার নয়। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই। তবু সেই বিদেহী আত্মা শান্তি লাভ করুন এই কামনা করি। সময় মতো আমি শ্রদ্ধেয় ডঃ হরিপদ চক্রবর্তীর কাছে যেতে পারি নি। সেজন্য আমি খুবই লজ্জিত। সময় করে একদিন তাঁকে প্রণাম করতে যাবো এই ইচ্ছা রইল।

- - - - - - - -

(** রচনাকাল – মার্চ, ১৯৯৩)

একটি সাক্ষাৎ **অশোক রায়**

বছর ছ'এর আগেকার কথা।

ডিসেম্বরের এক কনকনে সকালে আসানসোল ষ্টেশনে নেমেছি আড়ষ্ট হাত, পা, বশে আনার জন্যে। সেই হাওড়া ষ্টেশন থেকে এতটা পথ মুখ বুজে এসেছি, রবিবারের কাগজ প্রায় মুখস্থ, হেনকালে ছাত্র জীবনের এক ঘনিষ্ঠ সহচরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। প্রমাণ করে দিলে এটা সত্যিই পৌষ মাস। চলে এলাম একই কম্পার্টমেন্টে – প্রায় আঠারো বছর বাদে আমাদের দেখা, ধানবাদের গাড়ীতে মেল গাড়ীর স্পীড, মোট চারজন - সুরু হলো আমাদের এই পরিণত বয়সে বালক সুলভ চপলতা।

বন্ধুটির সেই ফেমাস দুষ্টুমির হাসির সঙ্গে প্রশ্ন করলে – 'কি রকম দেখছিস?' উত্তরে বললাম, 'তোর চাঁদ নামের সঙ্গে চেহারার এখনও অদ্ভুত মিল রয়েছে, পুরোনো গ্ল্যামার পুরো মাত্রায় অটুট ! আমি তো বুড়িয়ে গেছি।'

চাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় তার এক আত্মীয়ের মারফৎ। আমি পড়তাম স্কটিশে ও ছিলো আশুতোষে। ওর বাড়ী ছিল ঘন ইউরোপীয়ান বেষ্টিত আলিপুরে। হাবভাবে চলা ফেরায় চোখ টাটানো ওয়েষ্টার্নাইজড্। (অনেকটা ডিনার সুটের ক্রীজ্ নষ্ট হবে বলে শোবার ঘরেতে হরলিক্স্ খেয়ে রাত কাটানো)। কখনো কদাচিৎ দর্জিপাড়ায় আমার বাড়ীতে এলে তখনকার মনোবৃত্তিতে কিছুটা বিব্রত হয়েছি ওর অস্বস্তিতে। সেই পুরো সাহেবী ঘরানার ব্যক্তির মুখে আঠারো বছর বাদে এই ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেসে শুনলাম এক মহাপুরুষের কথা - যিনি ওকে বারংবার সাংসারিক, বৈষয়িক, দৈহিক, নানান সঙ্কটময় অবস্থা থেকে উদ্ধার করছেন। তাঁর অশেষ করুণায় সে অনাবিল আনন্দে মেতে আছে। জীবনকে চ্যালেঞ্জ করছে তাকে সঙ্কটে ফেলার জন্যে। সে আরও বলে তুড়িতে উড়ে যায় "বিপদ আপদের" মুহূর্ত। বললাম – "একটু হজম হতে দে"- তোর মনে আছে বাড়ীতে অন্নপূর্ণা পুজোর কথা - সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছি "তোকে বাদ দিয়ে"-কারণ ছিলো তোর অদ্ভুত মনোভাব,

যদি পুজোয় এসে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিস। কিন্তু আজ এই গাড়ীতে - "একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে"?

ধানবাদ পর্যন্ত একটানা আলাপে শুনলাম সেই মহাপুরুষের কথা। কিছুটা কৌতুক বোধ করেছিলাম। ঐ সময় আমার চলছিলো সর্ব্ববিষয়ে ফ্রাষ্ট্রেসান্। অনেক অলৌকিকতা দেখেছি, সাক্ষাৎ হয়েছে তথাকথিত বড় বড় সাধু সন্ন্যাসী, অসীম ক্ষমতার অধিকারী তান্ত্রিকের। কিন্তু আসল জায়গায় মর্ম্মান্তিক আঘাত পেয়ে হয়েছি 'ক্ষুধিত পাষাণে'র মেহের আলী। তবে তার মতন চীৎকার করে নয়, বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে বলতাম সব ঝুট হ্যায়-।

কলকাতায় ফিরে একদিন বন্ধুর সঙ্গে এলাম অক্ষয় বসু লেন। তখন বাড়ীটির চেহারা ছিলো জরাজীর্ণ, এক গোলক ধাঁধার মধ্য দিয়ে কয়েকটি ছাগল চরিয়ে উপস্থিত হলাম এক ছোট্ট ঘরে। সেই ফ্রাষ্ট্রেসানের ঘোরে কিছুটা কৌতুকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল 'মহাপুরুষের' সঙ্গে।

একটি জিনিষ সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছিলো - তাঁর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুগঠিত দেহ। বাংলাদেশে আজও ঐ চেহারা দুর্লভ। তাঁর চাহনির ভেতর ছিলো সর্বজানার হাসি - যা মনে এনে দেয় আর কোনও প্রাইভেসি রইলো না, মনের সব কিছু গোপন তথ্য তাঁর জানা হয়ে গেল। যতক্ষণ ছিলাম যতবার তাঁর দিকে তাকিয়েছি, সেই হাসি যা আজও আমার থমকে যাওয়ার মুহূর্তের অপার আনন্দ। বললেন – 'কয়েক বছর বাদে আবার আমার এখানে আসতে হবে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম – 'কোন প্রয়োজন আমার নেই।' মনে হলো একবার বলি বন্ধুটির মতো পাগল আমি নই।

বছর কাটছে। মনের ত্রিসীমানায় কোনদিন তাঁকে নিয়ে আসিনি। ভুলেই গেছি তাঁকে সম্পূর্ণভাবে। বছর দুই আগে একজনকে বলেছিলাম - "এক মহারাজ তোমার কথা বলেছিলেন অনেকদিন আগে, যখন তুমি আমায় চিনতে না।" আরও কিছুদিন বাদে কোনও ব্যাপারে বিব্রত হয়ে জিনিষপত্র যোগাড় করেছিলাম - অস্তাচলে পাড়ি দেবার জন্যে। যার কাছে বলেছিলাম মহারাজ সম্পর্কে, তিনি আমায় বাধ্য

করলেন তার কাছে যাবার জন্যে। তাই একদিন এসে দাঁড়ালাম মহারাজের দরবারে। বাড়ীটির শ্রীমণ্ডিত আকার আমায় বিভ্রান্ত করেছিলো। পেছনের গাড়ীর হর্ণে সরে দাঁড়ালাম - দেখি তিনি গাড়ী থেকে নামছেন। অতি পরিচিত হাসির বিনিময়ে তাঁর আমন্ত্রণে ঘরে এলাম। লুটিয়ে পড়েছিলো আমার দেহ তাঁর চরণের উপর। মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, বললাম - "আমি চাঁদের বন্ধু অনেকদিন আগে এসেছিলাম - আপনার বোধ হয় মনে নেই"। প্রথম সাক্ষাতের সময় ছিলো মিনিট পাঁচেক। আজ ছয় বছর বাদ আমাকে তাঁর মনে আছে হাজার লোকের ভিড়ে, এমন কি আমার নামটিও। বললেন, "চেয়ারে বসুন"। জবাবে বলি – "অত স্পর্ধা আমার নেই!" "কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের দিনে তো আমার ঘাড়ের ওপরই বসেছিলেন"।

তারপর শুরু হলো তীর্থ যাত্রা। চুপ করে বসে থাকতাম, নানান রকম আলোচনা নানান প্রকৃতির লোক, এর মধ্যে সত্যিকারের রাজাও আছেন, আর রয়েছে 'লাটু মহারাজ' - কাঠ বেচে কেনে - এক বিহারী বুড়ীর নাকমুখে সর্দি লাগানো এক ১০ বছরের বালক। ঘৃণা নেই, ব্যবহারের তারতম্য নেই, নেই কারুর প্রতি সাদর আহ্বান বা কারুর প্রতি আসক্তভাব। রাঁচী ফেরত এক সম-ব্যবসায়ীকে তাঁর কাছে নিয়ে এলাম। ব্রেনের অস্ত্রোপচারেও কোন ফল হয় নি - তাকে আজ এই প্রবন্ধ রচনার দিন দেখেছি অফিসে এসে পাটোয়ারী বুদ্ধিতে মাল কিনতে। পুলিশ কোর্টের আসামী, অবস্থার বিপাকে কর্ম্মে দোষী, বিচারের ফয়সালা বহুদিন আগেই হওয়া উচিত, তার আজও দিন পড়েনি, জেলে যাওয়া হয় নি। বলতে গেলে পার্থসারথি পত্রিকার দশ বছর বয়সের সব কটি খণ্ডের অংশগুলো এক করে সংযোজিত করলেও শেষ হবে না আমার অল্প দিনের জানার ইতিহাস। এনার সান্নিধ্যে আমার হতচেতন মনে এসেছে এক অপূর্ব্ব পুলক যা সারাদিন আমায় মাতিয়ে রাখছে, অনুভব করছি অন্তরের আকুলতার মধ্যে এক স্নিগ্ধতার ছায়া। মাঝে মাঝে বলতেন, "কি মশাই কবে আমায় পরীক্ষা করছেন?" প্রথম প্রথম তর্ক করতাম, এর শেষ

হতো সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে। বাহিরে এসে বুঝতাম (দাদা'র) মহাপুরুষের ইনসুংগার বলে আমার হার্ট ষ্ট্যাম্প বোল্ড আউট হচ্ছে বারংবার।

একদিন বললেন, 'বিরাটকে ভালোবাসেন, সেই শিবস্থান হিমালয়কে নিয়ে কিছু লিখুন।' বলি, 'হাস্যকর ব্যাপার আমার পক্ষে, লিখতে বসলেই মনে আসে তুমি কেমন? আমি ভালো আছি! অথবা উইথ রেফারেনস্ টু ইয়োর লেটার-।'

পরে শুরু হলো 'মহাহিমবন্তের আঙ্গিনায়'। কে আমায় লেখায়, কে অত সুন্দর নামকরণ করলো- সবই আমার কাছে রহস্য। যদি মহারাজ বলেন, 'দোতলাবাসের সামনে দাঁড়িয়ে ওর গতিরোধ করো' - বোধ হয় আমার রাস্তায় নামতে যা দেরী হবে আর এই অবিশ্বাস্য কাজও হয়ে যাবে। কয়েকমাস আগে ইচ্ছে করেই এক দুষ্কর্ম করেছিলাম - উদ্দেশ্য মহারাজকে বিব্রত করা। ঠাস্ করে আমার এক্সপেরিমেন্টের উপর চড় পড়লো। বহাল তবিয়তে ফিরে এলাম, সারা অঙ্গে একটুও আঁচ লাগলো না। ক'দিন গেলাম না ওনার কাছে। তারপর ওনার সামনে এসে দাঁড়ালাম, বললেন, 'আশ মিটলো'? জবাব এল না - আমার চোখের জল বোধ করি তিনিই দেখেছেন। তিনিই একজন সেই চোখের জল চিরতরে রোধ করার চেষ্টায় মেতে রয়েছেন।

আষাঢ় মাস পার্থসারথির জন্মমাস। আমার কাছে মহাপবিত্র সময়। এর যে কান্ডারী সে ভুলিয়ে দিয়েছে পারিপার্শ্বিক জগৎ, তাঁর সান্নিধ্যে অনুভব করি ঈশ্বরের অনুভূতি, পার্থসারথির সম্পাদক আমার সকল কর্মের সম্পাদক, আমার হতচেতন মনের নীল আকাশ -

"জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার রয়েছো দাঁড়ায়ে ....."

*** (শ্রীপ্রীতিকুমারের সম্বন্ধে স্মৃতিরোমন্থন – ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত পার্থসারথি পত্রিকার দশম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

মহাভারতে একটা শ্লোক আছে-

"সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্ত মুপাসীত হৃদয়ে না পরাজিতা।"

অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, প্রিয় অপ্রিয় জীবনে যা আসুক সেটাকে অপরাজিত হৃদয়ে ধারণ করে নিও।

কিন্তু সুখ-দুঃখের এতই মহিমা যে দুঃখ লুকিয়ে হাসা গেলেও সুখ লুকিয়ে কাঁদা যায় না। কারণ দুঃখ সুখের সন্ধানে থাকে অথচ সুখ দুঃখ থেকে পালিয়ে বেড়ায়।

'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।'

এক দুঃখী মনের বিরহ যন্ত্রণায় বিষাদ জনিত দুঃখে প্রশ্ন জাগে কার শান্তি? কিসের শান্তি? এমতাবস্থায় কার আনন্দ? কিসের আনন্দ? – সবই কি এক বিশাল শূন্যতার অদৃশ্য হাতছানি না মরীচিকার চিরকালীন শাশ্বত সান্ত্বনা?

গীতা এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন-

"আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।"

অর্থাৎ হে অর্জুন, সুখই হোক, দুঃখই হোক যিনি নিজের তুলনায় সকলের (অন্যের) প্রতি সমদর্শন করেন সেই যোগীই আমার মতে শ্রেষ্ঠ। (গীতা ৬-৩০/৩১/৩২)

অর্থাৎ দেখতে হবে, খুঁজতে হবে তোমার চাইতে বেশি দুঃখী কে বা কারা। তাদের দুঃখে বিচলিত হলে, সমব্যথী হলে, সহায়তা করলে অনেকাংশে দুঃখ লাঘব হবে। আনন্দের প্রাপ্তি হবে।

"আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" এবং "আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি"(তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৩/৬)। কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে বর্জন করে

নয়। দুঃখকে আত্মসাৎ করার আনন্দ। সুখ শব্দটার অর্থ তখনই হারাবে যদি এটি দুঃখের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ না হয়। জীবন দেবতার সঙ্গে জীবনের সুখকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই আনন্দ বা মুক্তি। রবীন্দ্রনাথও জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। তিনি নিজেই লিখেছেন "দুঃখের আঁধার বারে বারে এসেছে আমার দ্বারে।" তাই তিনি বলেছেন "সংসারকেই বড় আশ্রয় বলে ভেবো না এবং কঠিন দুঃখ বিপদে ভক্তির সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কাছে আত্ম সমর্পণ করতে শেখো। প্রতিদিনের সুখ-দুঃখে তাঁকে প্রণাম করার অভ্যাস রেখো। নিজেকে দুঃখী বলে চিন্তা করলে দুঃখের কালিমা বেড়ে ওঠে।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "এই দেহ ধারণ করে কত সুখে-দুঃখে কত সম্পদ-বিপদের তরঙ্গে আলোড়িত হবি। কিন্তু জানবি, ও-সব মুহূর্তকাল স্থায়ী। ওই সকলকে গ্রাহ্যের ভেতরে আনবি নি, 'আমি অজয় অমর চিন্ময় আত্মা'-এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। 'আমার জন্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই, আমি নির্লেপ আত্মা'-এই ধারণায় একেবারে তন্ময় হয়ে যা। একবার তন্ময় হয়ে যেতে পারলে দুঃখ কষ্টের সময় আপনা আপনি ওই ভাব মনে পড়বে, চেষ্টা করে আর আনতে হবে না।"

বাণী ও রচনা – স্বামী বিবেকানন্দ (৯ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৯৬)

মানুষের সুখ-দুঃখের অনুভূতি কোথায়, কীভাবে সৃষ্টি হয় এবং এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি? এর উত্তরে সুখ-দুঃখের অনুভূতি ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মনো-বৈজ্ঞানিকরা তিন ধরণের নিউরো ট্রান্সমিটারের কথা বলেছেন। সেগুলো হোল 'ডোপামিন', 'সেরোটনিন' এবং 'নরএপিনেফ্রোইন'। আরো অনেক জটিল কিছু আছে কিন্তু প্রধানতও এই তিনটিকেই মুখ্য বলা হয়। এ নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা এখনও রিসার্চ কোনো সঠিক পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়নি। এখন এ-আই টেকনোলজিও মানুষের মন নিয়ে রিসার্চ করছে। কেন মানুষ অতিরিক্ত সুখ বা দুঃখ সহ্য করতে পারে না?

এখন সংক্ষেপে সুখ এবং দুঃখকে পৃথক ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব। যদিও সুখ ও দুঃখ টাকার এ পিঠ আর ও পিঠ। সেই আদিকাল থেকে মুনি-ঋষিরা, দার্শনিকরা, বৈজ্ঞানিকরা সুখের সন্ধানে প্রকৃত সুখ কি তা জানতে চেয়েছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭/২৩) অধ্যায়ে "নারদ-সনৎকুমার সংবাদে" ভূমাতত্ত্বের কথা জানতে পারি। 'ভূমা' শব্দের অর্থ বিশালতা, ব্যাপকতা বা অসীমতা। সর্ববিদ্যাবিশারদ, ভক্তি শিরোমণি নারদ আত্মবিদ্যা লাভের জন্য ঋষি সনৎকুমারের কাছে এসেছেন। প্রণাম করে নারদ বললেন, "প্রভু আমি অনেক মন্ত্র, অনেক গ্রন্থ আবৃত্তি করেছি কিন্তু আত্মবিদ্যা আমার আয়ত্ত হয়নি। তাই আমি শোকগ্রস্ত। আপনি আমাকে উপদেশ দিন।" সনৎকুমার উপদেশ দিলেন, "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম। নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম।" (ছান্দোগ্য উপ। ৭/২৩/১)। ভূমাতেই সুখ (আনন্দ) অল্পে (অন্য কিছুতে) সুখ নেই। সুতরাং "ভূমা ত্বৈব বিজিজ্ঞসিতব্য।" অর্থাৎ ভূমাই তোমার উপলব্ধির বিষয় হওয়া উচিত। সীমার মধ্যে সুখ নেই - "ভূমৈব সুখম্"। কিন্তু ভূমাকে কোথায় পাব? তিনি সুখের স্বরূপ ভূমানন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন "ভূমাকে আহারে বিহারে, আচারে বিচারে, ভোগে নৈবেদ্যে, তন্ত্রে মন্ত্রে লাভ করা যায় না। তাকে পেতে হয় বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে। এর জন্য সাধনার প্রয়োজন - তবে অনুষ্ঠানে নয়, নিজের চিন্তায় ও কর্মে সেই পরম ভূমার সাধনা। আমার মধ্যে যে মহান আত্মা আছেন, যিনি জরা-মৃত্যু-শোক-ক্ষুধা-তৃষ্ণার অতীত তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে। বাউল কবি সেই কথাই বলেছেন- "মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ"।

ভূমাকে লাভ করার জন্য লোকালয় ত্যাগ করে গিরি গহ্বরে যাবার প্রয়োজন নেই। ভূমার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন তা হোল মানসিক সাধনা অর্থাৎ মন যাকে স্বীকার করে তাই। ভূমা বা আনন্দ আছে মানুষের মনে। এই সুখ অনাবিল সুখ নয় সুখ-দুঃখ মিশ্রিত। মানব জীবনের তিনটি পর্যায় বা স্বরূপ - শান্তম, শিবম, অদ্বৈতম। শান্তম হোল নিরবচ্ছিন্ন সুখের পর্যায়, শিবম - জীবন সংগ্রামের পর্যায় (অর্থাৎ সুখ দুঃখ ভরা), অদ্বৈতম হল - সুখ বা আনন্দের পর্যায় অর্থাৎ জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-

বেদনা, শোক ইত্যাদি সবকিছুতেই আনন্দ (সুখ)। তাই সুখও আনন্দ, ব্যথা-বেদনা ভরা সংঘাত মুখর সুখ (আনন্দ)। -"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং পাহি নিত্যম।" অর্থাৎ দুঃখকে স্বীকার করেই তাকে অতিক্রম করতে হবে তাহলেই সুখ বা আনন্দকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে।

পৃথিবীতে পশ্চিম দেশেও বিভিন্ন দার্শনিকরা সুখের অন্বেষণ করেছেন এবং নিজের মত করে মত ব্যক্ত করেছেন। সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। পরন্তু সুখের সন্ধানে তাদের মতবাদ সর্বমান্য হয়নি। এরা সবাই এক বিষয়ে ঐক্যমত যে জীবনের পরম কাম্য বস্তু অর্থাৎ সুখ কামনা করা এবং দুঃখকে ত্যাগ করা মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। + সুখ – দুঃখ এই কথাটি বিখ্যাত দার্শনিক 'মিল' এক অর্থে ব্যবহার করেছেন। সকলের সুখ আমাদের কাম্য সে বিষয়ে প্রমাণ দিয়ে 'মিল' বলেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ তার কাছে ভালো তাই সকলের সুখ সমষ্টিগতভাবে সকলের ভালো।' মিলে'র সঙ্গে 'বেন্থামের' প্রধান পার্থক্য ছিল তিনি সুখের গুণগত বিভাগ রেখে ব্যাখ্যা করেছেন মানুষ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। তাই প্রাণের ধর্ম ও প্রাণিজগতের ক্রমিক অভিব্যক্তির ধারা সম্বন্ধীয় ইতিহাসের জ্ঞান না থাকলে জীবনের আদর্শ ও কর্তব্যগুলো নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। সুখ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত সরল করে না আনতে পারলে জীবনে যথার্থ সুখ পাওয়া যায় না।' কিন্তু যথার্থ সুখ বলতে কি বুঝি?

প্রকৃত সুখ একটা মানসিক অবস্থা –যা অনুভূতি, ভালোবাসা, তৃপ্তি, সন্তুষ্টি এবং আনন্দ বা উচ্ছ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ম্যাথু রিকার্ড মাত্র ৬৪ বৎসর বয়সে একজন অণুজীব বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত। তিনি একাধারে লেখক, আলোক-চিত্রশিল্পী,গবেষক, অনুবাদক ও একজন ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু। এই মানুষটিই নাকি বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষ হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন। তাঁর ধ্যানমগ্ন জীবন দর্শনই প্রকৃত সুখের চাবিকাঠি। সুখের উৎস এবং পরিমাপ করা আধুনিক বিজ্ঞানে চেষ্টা চলছে কিন্তু এখনও সফলতা অর্জন করা যায়নি। অষ্টাদশ শতকে সুখ বলতে বোঝা যেত

'সমৃদ্ধি, উন্নতি এবং সুস্থতা'। ভারতীয় দর্শন বলছে সুখ বাইরে নেই। জাগতিক সুখ প্রকৃত সুখ নয়। মানুষকে নিজের মধ্যেই সুখ খুঁজতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন-"সংসারে সুখ তো দেখছো - যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া"। তাদের মধ্যে নৈতিকবিধি কেবল প্রাণীবিদ্যার (Biology) নীতি থেকে লাভ করা যায় ইত্যাদি। হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে প্রাণী জগতের ক্রমিক পরিবর্তনের এক বিশেষ অবস্থায় মানুষের আবির্ভাব। তিনি বলেন প্রাণশক্তি এক বিশেষ শক্তি। এটি এক আত্মরক্ষা এবং বংশ ও জাতি রক্ষা করার শক্তি। তাঁর মতে বংশরক্ষা এবং সুখ পূর্ণ সুদীর্ঘ জীবন লাভ করা প্রাণীদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যখনই প্রাণী প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে সমর্থ হয় সে সুখ অনুভব করে। যখন সে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে অসমর্থ হয়, তখন সে দুঃখ ভোগ করে। সুখলাভ দুঃখের হাত থেকে মুক্তি জীবের একমাত্র কাম্য।

স্পেন্সার সুখবাদী হলেও আত্মসুখবাদ ও পরসুখবাদের এক সমন্বয় করেছেন। স্পেন্সারের মতবাদ এবং স্টিফেন ও আলেকজান্ডারের মতবাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান। ওদিকে সিজউইক (Sidgwick) একজন সুখবাদী। তবে তার সুখবাদ বেন্থাম ও মিলের সুখবাদের ন্যায় মনোবিজ্ঞান সম্মত সুখবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তিনি মনোবিজ্ঞান সম্মত সুখবাদ খণ্ডন করেন। তিনি বলেন সুখাকাঙ্খা দুঃখ সৃষ্টি করে। এভাবে তিনি প্রমাণিত করেছেন যে মনোবিজ্ঞান সম্মত সুখবাদ যুক্তিসম্মত মতবাদ নয়।

কিন্তু সুপ্রাচীন ভারতীয় বৈদিক দর্শন বিশ্বের সমস্ত প্রাণীদের 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' প্রসঙ্গে বলেছেন-

"সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগভবেত।।"

সকলে সুখী হোক, সকলে নীরোগ হোক, সকলের মঙ্গল হোক। কেউ যেন দুঃখ প্রাপ্ত না হয়।

সুখের বিপরীতে দুঃখের অবস্থান। দুঃখ প্রসঙ্গে স্বামী প্রেমেশানন্দ উপনিষদের ব্যাখ্যার বিষয়ে বলেছেন, "মানুষের দুঃখ তিন প্রকার - আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক।

আধিদৈবিক - যে দুঃখ দেবতার কোপে হয়ে থাকে। অনাবৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, বজ্রপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপদ্রব - একে ত্রিতাপ বলে।

আধিভৌতিক - ভূতগণ অর্থাৎ জীবগণ হতে যে দুঃখ জন্মে যেমন মশা, মাছি, চোর-ডাকাত, হিংসুক, নিন্দুক প্রভৃতির উপদ্রব।

আধ্যাত্মিক - আত্মার অর্থাৎ নিজের দেহ-মন-বুদ্ধিতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহা আধ্যাত্মিক দুঃখ। যেমন দেহে রোগ-জরা-মরণ; মনে রাগ, দ্বেষ, লোভ; বুদ্ধিতে- জ্ঞানী, অজ্ঞান, উচ্চনীচ, ব্রাহ্মণ, চন্ডাল, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী ইত্যাদি ভেদবুদ্ধি-জাত বেদনা।

জ্ঞান হলে এই তিন প্রকার দুঃখ সম্পূর্ণ রূপে দূর হয়। জীবন পথের পথিক আমরা, কিন্তু এই পথেরও শেষ আছে। মহাসিন্ধুর ওপারে ওই যে দেখা যায় আনন্দধাম।

"পুত্রদারাপ্তবন্ধুনাং সঙ্গমঃ পাসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্তেতে স্বনো নিদ্রানুগো যথা।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৭/৫৩)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্ত উদ্ধবকে বলেছেন 'প্রিয় উদ্ধব, এ সংসার আত্মীয়-পরিজন বেষ্টিত এক পান্থশালা। এতে ভুলে থেকো না, এসবই অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর। আমরা আসি, নিজ নিজ কর্ম শেষে যে যার গন্তব্যে চলে যাই। এখানে কেউ কারো সঙ্গী নয়। দুদিনের রঙ্গমঞ্চ মাত্র।

গীতাতে দুঃখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে। (গীতা ২/৫৬)

অর্থাৎ যিনি দুঃখে উদ্বেগ শূন্য, সুখে যিনি স্পৃহা শূন্য, যার অনুরাগ, ভয় এবং ক্রোধ নিবৃত্ত হয়েছে তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

কিন্তু গীতার এই বাণী কি সাধারণ শোকগ্রস্ত মানুষকে এত সহজে শান্তি প্রদান করতে পারে? মানুষের মধ্যে যে দুঃখ আছে তার মতো করে কি অন্য কেউ সে দুঃখ বুঝতে পারে? সমব্যথী হতে পারে? 'চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?'

হ্যাঁ অবশ্যই পারে। মহাকালের চিরন্তন সান্ত্বনা-

"সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ, দুখ জ্বালা সেই পাশরে-
সব দুখ জ্বালা সেই পাশরে"।

সন্ত কবীর বলেছেন যে মূর্খরাই নিজ অন্তরের পরিবর্তে বাইরে সুখ ও শান্তির সন্ধান করে থাকে। আমাদের কর্তব্য হল চেতনার অন্তরালে সেই চৈতন্যের সন্ধান করা, যাকে বলা হয় পরম চৈতন্য। প্রত্যেকেই অসীম সুখ এবং শান্তি চায়, অথচ সেই পরম সত্যটি আমাদের সকলের মধ্যেই বর্তমান। বাইরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলি শুধুমাত্র অস্থায়ী সুখের সন্ধান প্রদান করে, যা কখনও চিরস্থায়ী হয় না। তবুও দেখি-

আপন সৃষ্টির পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়।
কিংবা এ কি মহাকাল কল্পকল্পান্তের দিনে রাতে
এক হাতে দান করে ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে।
সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন,
কিন্তু কেন?
তার পরে চেয়ে দেখি মানুষের চৈতন্য জগতে
ভেসে চলে সুখ-দুঃখ কল্পনা ভাবনা কত পথে।
কোথাও বা জ্বলে ওঠে জীবন-উৎসাহ,
কোথাও বা সভ্যতার চিতাবহ্নিদাহ
নিভে আসে নিঃস্বতার ভস্ম-অবশেষে
নির্ঝর ঝরিছে দেশে দেশে .....

কিন্তু কেন?

(রবীন্দ্রনাথের 'কেন' কবিতার অংশ বিশেষ)

এই বিশ্ব সংসারের মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ১৮৮৪ সালের ১লা জানুয়ারী অসুস্থ শরীরে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে বৃক্ষের নীচে উপস্থিত ভক্তদের আশীর্বাদ করে বলেছিলেন "তোমাদের চৈতন্য হোক"। যে চৈতন্য লাভ করতে হলে মানুষকে কঠিন সাধনা করতে হয়, সেটাই সহজ লভ্য করে দিলেন কল্পতরু হয়ে। সেই থেকে আজও ১লা জানুয়ারী কল্পতরু উৎসব পালিত হয়।

কিন্তু কি এই চৈতন্য?

চৈতন্য একটি সংস্কৃত শব্দ। যার অর্থ চেতনা। এর অর্থ আত্মা, বুদ্ধি, শক্তি, উৎসাহ বা সংবেদন। যোগে প্রকাশিত ব্রহ্মের মৌলিক স্বরূপই চৈতন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন, "অদ্বৈত জ্ঞান না হলে চৈতন্য দর্শন হয় না। চৈতন্য দর্শন হলে তবে নিত্যানন্দ। পরমহংস অবস্থায় এই নিত্যানন্দ।"

চৈতন্য দুই প্রকার। উপাহিত চৈতন্য ও অনুপাহিত চৈতন্য (যাঁরা ঈশ্বরের দ্বারা প্রভাবিত ও যাঁরা কোন বাহ্যিক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত নয়) পরমাত্মার একই চৈতন্য সত্তায় পর্যবসিত হয়, এই জ্ঞান যখন অনুভূত হয় যখন সেই স্ব-স্বরূপে স্থিত জ্ঞানীকে কোনোরূপ ক্লেশ স্পর্শ করতে পারে না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বলেছেন-

"স্বপ্নজাগরিতে সুপ্তিং ভাবা ভাবোভাবৌ ধিয়াং তথা।
যো বেত্তবিক্রিয়র সাক্ষাৎ সোহমিত্যবধারয়।।

অর্থাৎ যে অধিকারী সত্তা জাগ্রত – স্বপ্ন –সুষুপ্তি এবং বুদ্ধি সমূহের ভাব ও অভাবকে সাক্ষাৎ রূপে জানেন, সেই চৈতন্যই আমি – এইরূপ অবধারণা করো।

'ত্বম' পদে যে চৈতন্যসত্তা লক্ষিত হয়, তা অবধারণের জন্য সাক্ষী চৈতন্যকে অবধারণ করতে বলেছেন।

সাধারণ দৃষ্টিতে মন বুদ্ধির কার্য দেখে তাদের চৈতন্য বলে ধারণা হয়। পরন্তু ওইগুলি চৈতন্যের সান্নিধ্যে তদ্ধত ক্রিয়াশীল হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন

– অগ্নিযোগে আলু পটল জড় হলেও লাফায়। সেরূপ মন-বুদ্ধি যে চৈতন্যের সন্নিধ্যে ক্রিয়াশীল, সেই চৈতন্য সত্তাই জীবের প্রকৃত স্বরপ ও 'ত্বম' পদের লক্ষার্থ।"

এইভাবে দেহী হলো চেতন, আত্মা। আত্মা যে চেতন সে সম্বন্ধে শ্রুতি বলছেন - "সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম"। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই কথাটাই সহজ করে বলেছেন "চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎ।"

তিনি বলতেন "ছোকরাদের এত ভালোবাসি কেন জান? ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়-ঠাকুরসেবায় চলে। জোলো দুধ অনেক জ্বাল দিতে হয় – অনেক কাঠ পুড়ে যায়। ছোকরারা যেন নতুন হাড়ি - পাত্র ভাল - দুধ নিশ্চিত হয়ে রাখা যায়। তাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়। বিষয়ী লোকদের শীঘ্র হয় না। দইপাতা হাড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন- "চৈতন্যকে জড়ের ভূমিতে টেনে না এনে – জড়কে চৈতন্যে পরিণত কর। অন্ততঃ প্রত্যহ একবার করে সেই চৈতন্য রাজ্যের - সেই অনন্ত সৌন্দর্য, শান্তি ও পবিত্রতার রাজ্যের একটু আভাস পাবার এবং দিনরাত সেই ভূমিতে বাস করবার চেষ্টা কর। অস্বাভাবিক আলৌকিক কিছু খুঁজো না, ওগুলো পায়ের আঙ্গুল দিয়েও স্পর্শ করো না। তোমাদের আত্মা দিবারাত্র অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় তোমাদের হৃদয় তোমাদের হৃদয়সিংহাসনবাসী সেই প্রিয়তমের পাদপদ্মে গিয়ে সংলগ্ন হতে থাকুক, বাকী যা কিছু, অর্থাৎ দেহ প্রভৃতি –তাদের যা হবার হোক গে।"

'কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হোল।
প্রবাহের বারি বহিতে কি পারি,
যাই – যাই – কোথা? কূল কি নাই,
কর হে চেতন কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন?
কে আছ চেতন ঘুমাও না আর,

দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার।
কর তমো নাশ হও হে প্রকাশ
তোমা বিনে আর নাহিক উপায়
তব পদে তাই শরণ চাই।’

পিসার মিরাকল

শ্রী অরূপকুমার ভট্টাচার্য

মধ্য ইতালির তুস্কানি অঞ্চলে অ্যারণ নদীর তীরে অবস্থিত শহর পিসার কথা ভাবলেই প্রথমে যে ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম মিরাকল স্কোয়ারের হেলানো টাওয়ার। এমন নয় যে এর থেকে বেশী হেলে পড়া মিনার পৃথিবীতে আর নেই। আবুধাবির “ক্যাপিটাল টাওয়ার” তো পিসার তুলনায় অন্ততঃ সাড়ে চারগুণ বাঁকা। তবু যে প্রতি বছর এখানে পঞ্চাশ লক্ষাধিক দর্শক সমাগম হয় তার কারণ টাওয়ারের প্রাচীনত্ব এবং অবশ্যই তার অসাধারণ স্থাপত্য। এই ইতালিতে এসে কেউ পিসার হেলানো টাওয়ার দেখবেন না এটা যেন হতেই পারে না। শুধু তো টাওয়ার নয়, প্রাচীরে ঘেরা ২১.৯ একর জমির মিরাকল স্কোয়ারে এলে যে এক যাত্রায় চার দর্শন! আসছি সে কথায়, আগে তো সেখানে এসে পৌঁছই।

রওনা হয়েছিলাম ভেনিসের কাছের শহর পদুয়া থেকে। রাত কেটেছিল যে হোটেল Antony-তে, সেখান থেকে পিসার দূরত্ব নয় নয় করেও প্রায় ৩০০ কিলোমিটার। তাই সকাল ন’টায় হোটেল ছাড়লেও জানতাম Bologna হয়ে গন্তব্যে বাস পৌঁছাতে দুপুর একটা বেজে যাবে। পথ মাখনের মতো আর অ্যাভারেজ স্পীড ১০০ কিলোমিটার হলে হবে কি, লাঞ্চ ব্রেকের সাথে ফ্রি ওয়াসিং রুম পেলেও যে পথে একবার থামতে হয়। সারা ইউরোপে এই এক সমস্যা। ফ্রি টয়লেট পেলেন

তো ভালো, না হলে জনা প্রতি কমপক্ষে এক ইউরো অর্থাৎ প্রায় ১০০ টাকার ধাক্কা। পথের দুধারে সবুজ পাহাড়, মাঝে মাঝে ছবির মতো সুন্দর গ্রাম। নিজেরা এলে ইতালির আরেকটা ছবি 'ফ্লোরেন্স' হয়তো দেখে নেওয়া যেত, কিন্তু ট্যুর কোম্পানি তো তাদের ভ্রমণসূচীর বাইরে যাবে না। দৃশ্য যতই সুন্দর হোক, ভারতেও তেমনটা যথেষ্টই আছে। শুধু জনসংখ্যা, দারিদ্র্য আর ডিসিপ্লিনের অভাব দীর্ঘমেয়াদে তাকে সুন্দর থাকতে দিচ্ছে না। আর রাস্তার কথা যদি বলেন, যে সোনালী চতুর্ভূজের স্বপ্ন ভারতের বড় বড় শহরগুলোকে এক সূতোয় গাঁথতে চেয়েছে, সে রাস্তা কি কোনও অংশে কম? অভাব শুধু সিভিক সেন্সের। লন্ডন থেকে প্যারিস, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, অস্ট্রিয়া হয়ে ইতালি পৌঁছোতে হাজার মাইল পথ পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু কখনো কোন হর্ণের ভেঁপু শুনেছি বলে মনে পড়ে না। উল্টোপাল্টা রাস্তা পারাপারের প্রশ্নই নেই – ভুল করলেই মানিব্যাগ ফাঁক! তবু হাজার সমস্যা নিয়েও বৈচিত্র্যে ভরা ভারতের তুলনা কিন্তু কোথাও নেই, কারণ পয়সা না থাকলেও এখানে প্রাণ আছে।

ইউরোপে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাগুলো দর্শনীয় স্থান থেকে অনেকটাই দূরে, তাই পিসায় যে পার্কিং জোনে আমাদের বাস যাত্রা শেষ হয়ে গেল, সেখান থেকে 'Piazza dei Miracoli' বা মিরাকল স্কোয়ারের দূরত্ব নেহাৎ কম নয়। দলে সিনিয়র সিটিজেনরাই সংখ্যায় বেশি। তাই পায়ে পায়ে এতোটা পথ চলতে অনেকেরই হয়তো অসুবিধে হত। মুশকিল আসান হিসেবে পেয়ে গেলাম এক ব্যাটারি চালিত ট্রাম। ব্যাটারি চালিত, তাই মাথার উপর তারের প্রশ্ন ছিলো না, নেই চাকার নীচে কোনও ট্রাম লাইনও! দুই কামরার সাদা রঙের ট্রামটা পুরোপুরি আমাদের করে নিতে যাতায়াতের জন্য দিতে হয়েছিল জনা প্রতি চার ইউরো। টাকায় হিসেব না করাই ভালো, এখানে দুজনের ট্যাক্সিতেও এতো টাকা লাগে না।

এবারে আসি আমাদের ভাষায় 'মিরাকল স্কোয়ারের' কথায়। ১৯১০ সালের আগে যার নাম ছিলো 'পিয়াজ্জা দেল ডুওমো', এখন ইতালিয়ান ভাষায় সেটাই হয়েছে পিয়াজ্জা ডি মিরাকোলি। ইউরোপীয় মধ্যযুগের স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য বিখ্যাত এই স্কোয়ার আজ ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে

তালিকাভুক্ত। আগেই বলেছি, মিরাকল স্কোয়ার মানে এক যাত্রায় চার দর্শন। যেটা বলিনি এ ছাড়াও অপূর্ব মখমলের মতো এখানকার সবুজ লনের কথা। বাঁধানো পথে ঘেরা সে সবুজ কার্পেটে হেঁটে চলার পর্যটকের দলে কিছুক্ষণ সামিল হওয়াই যায়।

যে স্থাপত্যের জন্য মিরাকল স্কোয়ারকে সকলে চেনে, সেই টাওয়ার আসলে তৈরি হয়েছিল পিসা ক্যাথেড্রালের ঘণ্টাঘর হিসেবে। সময়ের দিক থেকে হিসেব করলে অবশ্য আশ্চর্য এই টাওয়ার এখানকার তৃতীয় স্থাপত্য – ক্যাথেড্রাল আর সেন্ট জন ব্যাপ্টিস্টারির পরে। স্কোয়ারের চতুর্থ এবং শেষ ভবন ক্যাম্পোসান্টো। বলছি একে একে চার স্থাপত্যের কথা। ১১৭৩ সালে যখন ঘন্টাঘর বা 'Campanelle'-এর জন্য মাটি খোঁড়া শুরু হয় তখন বোঝা যায় নি যে নরম মাটিতে মাত্র তিন মিটার গভীরতার ভিত্তি আটতলা বিশিষ্ট ৫৬ মিটার উঁচু স্ট্রাকচারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মিনারের নকশাতেও কিছু ত্রুটি অবশ্যই ছিল। তাই ১১৭৮ সালে তিনতলা তৈরি হতেই মিনার হেলতে শুরু করে। ইতিমধ্যে লুক্কা এবং ফ্লোরেন্সের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় নির্মাণ কার্য্য থেমে থাকে একশো বছরেরও বেশি। তারপর ১৩৭২ সালে যখন মিনার নির্মাণ সমাপ্ত হয়, ততদিনে ১৪,৫০০ টনের মিনার প্রায় ৩.৯৯ ডিগ্রী কোণে হেলে পড়েছে। বহু শতাব্দী মোটামুটি একই রকম থাকার পর ১৯৯০ সালে যখন দেখা যায় হেলে পড়ার পরিমাণ ৫.৫ ডিগ্রীতে পৌঁছে গেছে, তখন ১৯৯৩ থেকে ২০০১ সালে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাকে কিছুটা হলেও সোজা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমানে মোটামুটি ৩.৯৯ ডিগ্রী হেলে থাকায় সিঁড়ি বেয়ে উঠলে দেখা যায় উত্তরমুখী সিঁড়ি (২৯৪) দক্ষিণ দিকের চেয়ে (২৯৬) দু স্টেপ কম। পিসার টাওয়ার নিয়ে অনেক গল্পও চালু আছে; তার মধ্যে ১৫৮৯ থেকে ১৫৯২ সালে পতনশীল বস্তুর নিয়মগুলি নিয়ে গ্যালিলিওর পরীক্ষার কথা তো সকলেই জানেন। মোটের উপর মিরাকল স্কোয়ারের পিসার হেলানো টাওয়ার আজ বিশ্বের পর্যটকদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। ইতালিতে এসে তার 'আইকন'কে তাই দেখতেই হবে।

পিয়াজ্জা ডি মিরাকোলির সবচেয়ে পুরানো স্থাপত্য পিসা ক্যাথেড্রালের আনুষ্ঠানিক নাম ‘প্রাইমেশিয়াল মেট্রোপলিটান ক্যাথেড্রাল অফ দ্য অ্যাসাম্পশন অফ মেরি’ (Cattedrale Metropolitana Primaziale di Santa Maria Assunta)। ভার্জিন মেরির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বোমানেস্ক স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত এই মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক ক্যাথেড্রালের নির্মাণ কার্য ১০৬৪ সালে শুরু হওয়ার পর পবিত্রকরণ হয় ১১১৮ সালে। অসাধারণ আভ্যন্তরীন নক্সা সম্বলিত গির্জায় রয়েছে মার্বেল পাথরের স্তম্ভ, গম্বুজ আর চমৎকার মোজাইকের কাজ। ১৫৯৫ সালে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রতিস্থাপিত ছাদ এবং প্রয়োজনীয় মেরামতির পর আজও এই গীর্জা সক্রিয়। প্রার্থনার জন্য আজও এখানে নিয়মিত সভার আয়োজন হয়।

পিসা ক্যাথেড্রালের আরেক নাম Duomo di Pisa। সেখানকার অনেক দ্রষ্টব্যের অন্যতম হল পেট্রন সেন্ট অফ পিসা। Saint Rainerius এবং পোপ Gregory VIII এর সমাধি, পবিত্র এই গীর্জায় যাঁরা সমাহিত হয়েছিলেন যথাক্রমে ১১৬০ এবং ১১৮৭ সালে। প্রার্থনা সভা, সমাধি, আভ্যন্তরীন অলংকরন এবং সর্বোপরি তার ঘণ্টাঘর নিয়ে ডুওমো ডি পিসার তুলনা নেই।

স্কোয়ারের দ্বিতীয় প্রাচীন বিল্ডিং হল সেন্ট জনের পিসা ব্যাপ্টিস্টারি বা Battistero di San Giovanni। ইতালির বৃহত্তম ব্যাপ্টিস্টারি তৈরি হওয়ার আগে যে পুরাতন ভবনটি ছিল তাকে প্রতিস্থাপিত করতে ১১৫২ সালে চার্চের এই অংশের নির্মাণ শুরু হয়, যদিও নির্মাণকার্য শেষ হতে সময় লাগে অনেকটাই – ১৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। এতটা সময় লাগার কারণ আগেই বলেছি, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সাথে পিসাবাসীদের যুদ্ধ। ৫৪.৮৬ মিটার উচ্চ আর ৩৪.১৪ মিটার ব্যাসের এই বিশাল রোমান ক্যাথলিক গির্জার নক্সা করেছিলেন যে স্থপতি সেই Diotisalvi সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও ১১৫৩ সালে তার সই করা দুটি পিলার আজও দেখা যায় ভবনের ভিতরাংশে। সেন্ট জন গীর্জার আরেক বৈশিষ্ট্য একাধারে দু’ই স্থাপত্যের সংমিশ্রন। নীচের অংশের বৃত্তাকার খিলানে রোমানেস্ক স্থাপত্যের পরিচয় থাকলেও উপর অংশ তৈরী হয়েছে গথিক শৈলিতে।

ক্যাথেড্রাল স্কোয়ারের চতুর্থ তথা সর্বশেষ ভবন ক্যাম্পো সান্টো (Campo Santo), স্প্যানীশ ভাষায় যার অর্থ পবিত্র ক্ষেত্র। দ্বাদশ শতাব্দীতে পিসার আর্চ বিশপ উবালদো ল্যানফ্রাঞ্চি (Ubaldo Lanfranchi), জাহাজ ভর্তি করে গলগোথা থেকে পবিত্র মাটি নিয়ে এসে ক্যাম্পো সান্টো নির্মাণে সহায়তা করেন। সিমেট্রি নির্মাণ অবশ্য শুরু হয়েছিল ১২৭৮ সালে। স্থপতি Giovanni di Simone দ্বারা। 'ব্যাটল অফ মেলোরিয়া'র নৌ যুদ্ধে পরাজয়ের বছর ১২৮৪-তে তার মৃত্যু হলে অন্যান্য ভবনের মতো এখানেও কার্য স্থগিত ছিল শতাধিক বছর। ১৪৬৪ সালে নির্মাণ কার্য শেষ হওয়ার পর ক্যাম্পোসান্টোই এখন পিসা ক্যাথিড্রালের সমাধিক্ষেত্র। মনে করা হয় পবিত্র মাটির গুণে সমাহিত হওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেহ নাকি মাটির সাথে মিশে যায়।

মিরাকল স্কোয়ার ছাড়া পায়ে পায়ে অ্যারণ নদীর ধারে 'Lungarni di Pisa'-য় কিছুটা সময় ঘুরে বেড়ানোই যায়, দুঃখের বিষয় সেই সময়টাই আমাদের ছিলোনা। তাই স্কোয়ারের তিন কিলোমিটারের মধ্যে থাকা পিসা শহরের আরেক ছোট গির্জা সান্টা মারিয়া ডেলা স্পিনা (Santa Maria della Spina) দেখে আমাদের ছুটতে হয়েছিলো প্রায় ৩৩০ কিলোমিটার দূরের শহর রোমের দিকে। আয়তনে ছোট হলেও গথিক শৈলিতে নির্মিত ১২৩০ সালের এই গির্জার মাহাত্ম্য এমনই যে 'যীশু'কে ভক্তি করেন এমন ধর্মপ্রাণ পিসা পর্যটক এখানে না এসে থাকতে পারেন না। আসলে স্পিনা কথার ইংরেজি অর্থ 'রেলিক অফ দ্য থর্ন'। মনে করা হয় যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় তাঁর মাথায় যে কাঁটার মুকুট ছিল তার অংশবিশেষ এই গীর্জায় আনা হয়েছিল ১৩৩৩ সালে। ১৮৭৯ তে অ্যারণ নদীর জলপ্লাবনে গির্জা ভেসে যাওয়ার পর নবনির্মিত ভবনে সে কাঁটার মুকুট আছে কিনা জানিনা, কিন্তু গীর্জার ভিতরে এলে সে সব প্রশ্ন মনে জাগে না, আপনা থেকে মাথা নত হয়ে যায় ঈশ্বর প্রেরিত সেই মহামানবের পায়ে।

তোমার যা কিছু আছে, সব দিতে হবে
নিঃস্পৃহ অন্তরে; চাইবে না কিছু তুমি,
শুধু দিয়ে যাবে, যা কিছু তোমার আছে
সর্বস্ব তোমার - চাই সর্ব সমর্পণ।
তবে তুমি কৃপা পাবে অজস্র ধারায়;
নেমে আসবে সেই কৃপা ঊর্ধ্বলোক হতে-
পূর্ণতার অমেয় সম্পদ।
আলোকে আলোকে উদ্ভাসিত হবে চারিধার।
সব-পাওয়া শেষ সেইখানে।

দাও তুমি, সব দিয়ে যাও।
এ বিশ্বাস থাকে যদি অন্তরে তোমার,
নামবেই সে-কৃপা-আলোক।
যখন তোমার দেওয়া সর্ব সমর্পণ
পূর্ণ হবে, সেই ক্ষণে, সেই মহাক্ষণে
নামবেই সে দিব্য আলোক
পরিতৃপ্ত প্রসন্ন আধারে।

পালিয়ে বাঁচা

সুনন্দন ঘোষ

এক বাল্য বন্ধুর আক্ষেপ -
যে মেয়েটাকে একবার দেখবে বলে কলেজ পালাতো –
বিয়ের পাঁচ বছর পরে সে কাছে এসে দাঁড়ালে
বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে – শাড়ী না সেরেল্যাক!
বন্ধুর প্রগতিশীলা মা ছেলের বউকে বিউটিপার্লারে নিয়ে যান,
হোটেল ম্যারিয়টে লাঞ্চ খাওয়ান –
কিন্তু বউটা পুজোর সময় বাপের বাড়ি যাবে বললেই
বাড়িতে আলো জ্বলে না, উনুনে হাঁড়ি চড়ে না।

অফিসের সাহেব চেয়ারে হেলান দিয়ে দু'হাত নেড়ে
ছেলের বিদেশী চাকরীর গল্প শোনান সারাদিন –
আর - পাঁচটার পর "মোষ্ট আর্জেন্ট" লেখা ফাইলগুলো
টেবিলে রেখে কাতর চোখে বলে যান –"প্লিজ এগুলো ..... ।"

একটানা জীবন খরচ হতে থাকে লোকাল ট্রেনের নিত্যযাত্রায়।
ছুটন্ত গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়ে যায়
ভিক্টোরিয়ার উড়ন্ত পরী।
বারান্দার টবে অ্যাডেনিয়ামের কুঁড়ি আসে –
ফ্ল্যাটের বন্ধ জানলায় বৃষ্টির কড়ানাড়া।
নিঃশব্দে একদিন একটা পাহাড়ের টিকিট কেটে ফেলি।
জানি পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা আসলে স্বার্থপর বিলাসিতা –
তবু পালিয়ে বাঁচতে ইচ্ছে করে –
একবার ---------- অন্ততঃ একবার ---------- ।